পরিশিষ্ট ঃ

পরিশিষ্ট - ১

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে রচিত গল্প, কবিতা, নাটকের তালিকা

(এ তালিকার বাইরেও কিছু শিল্পকর্ম রয়েছে, অসম্পূর্ণ তালিকার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী- গবেষক।)

শুধু উপন্যাস নয়, পঞ্চাশের মন্বন্তর শিল্পের প্রতিটি শাখায় ছড়িয়ে আছে। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, তৈলচিত্র, জলছবি, ক্যামেরার ফটোগ্রাফি, শিল্পীর আঁকা ছবি সমস্ত নান্দনিক শাখা মন্বন্তর থেকে কাঁচামাল নিয়ে প্রাচুর্যে ভরে তুলেছে ভান্ডার।

গল্পের তালিকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০)'ভিড়', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৩-১৯৮৭)'বীরুর প্রশ্ন', আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯)'লঙ্গরখানা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭১)'পৌষলক্ষ্মী', 'বোবাকান্না', 'ইস্কাপন', পরিমল গোস্বামীর (১৮৯৯-১৯৭১)'শেষের হিসাব', 'ভাঙ্গন', 'পরিচয়', 'কৃষ্ণহরির চাল', 'তারিণী মাস্টার', মনোজ বসুর (১৯০১- ১৯৮৭)'মন্বন্তর'(পরিবর্তিত নাম : 'দ্বীপের মানুষ'), সরোজ কুমার রায়চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৭২)'ক্ষুধা', 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী', 'ছন্ন-ছাড়া', 'আগুন', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬)'কালনাগ', 'কাক', 'কেরোসিন', 'হাড়', 'বস্ত্র', প্রবোধকুমার সান্যালের(১৯০৫-১৯৮৩)'অঙ্গার', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬)'কে বাঁচায় কে বাঁচে', 'আজকাল পরশুর গল্প', 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা', 'গোপাল শাসমল', 'তারপর', 'রাঘব মালাকর', 'নেড়ি', 'সাড়ে সাত সের চাল', 'প্রাণ', 'অমানুষিক', 'প্রাণের মূল্য', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের(১৯০৮-) 'ন্যায় ক্ষুধা হুঁ', 'মহাকালের নিশ্বাস', সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০)'কতটুকু ক্ষতি', সোমনাথ লাহিড়ীর (১৯০৯-১৯৮৪)'১৯৪৩', কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৪-১৯৭৯) 'নিম অন্নপূর্ণা', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫)'আবরণ', 'রসাভাস', 'রূপান্তর', 'নষ্ট', 'মদনভস্ম', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০)'নক্ত-চরিত', 'দুঃশাসন', 'কালো জল', 'পুষ্করা', 'হাড়', 'কবর', 'নিশাচর', 'ডিনার', 'ভাঙা চশমা', নবেন্দু ঘোষের (১৯১৭-)'কাক', 'বাঁকা আলোয়ার', 'বস্ত্রং দেহি', 'ছিন্নমস্তা', 'ত্রিশঙ্কু', 'এই শীতান্তে', মনী ভৌমিকের 'হটাবাহার', 'একটি দিন ১৯৪৪', 'কাফের', 'খুনীর মেলে', সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১)'নয়ন চারা', সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭)'ক্ষুধা', 'দুর্বোধ্য ইত্যাদি।

কবিতার তালিকা

অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬)'অন্নদাতা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮)'জনৈক', 'ফ্যান', 'রাত জাগা ছড়া', বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪)'শ্রাবণ', বিষ্ণু দের (১৯০৯-১৯৮২)'১৯৪৩ অকাল বর্ষা', 'এক পৌষের শীত', 'চতুর্দশপদী'। অরুণ মিত্রের (১৯০৯-)'জঠর', 'একটি নিবেদন', 'রাস্তা বোঝাই তোমরা', বিমলচন্দ্র ঘোষের (১৯১০-১৯৮২)'১৩৫০', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের (১৯১১-১৯৭৭)'আমাদের গান', দিনেশ দাসের (১৯১৩-১৯৮৫) বাংলা ১৩৫০', 'ভুখ-মিছিল', 'ডাস্টবিন', 'নববর্ষের ভোজ', 'গ্লানি', সমর সেনের (১৯১৬-১৯৮৭)'নষ্টনীড়', 'শহরে', 'নাচিকেত', '২২শে জুন', 'গৃহস্থ বিলাপ', 'আকাল', 'বিকলন', ' ক্রান্তি', কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের (১৯১৬-) 'মেঘমুক্ত', মনীন্দ্র রায়ের (১৯১৯-)'অনুভব', 'পঞ্চাশের প্রেত', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯২০)'চিরকুট', 'বর্ষশেষ', 'গ্রাম্য', 'এই আশ্বিনে', 'স্বাক্ষর', 'স্বাগত', সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭)'ঐতিহাসিক', 'এই নবান্নে', 'বিবৃতি', 'বোধন', 'ডাক' প্রভৃতি স্মরণযোগ্য কবিতা এই পটভূমিকায় রচিত।

নাটক ও একাঙ্কিকার তালিকা

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৯২-১৯৬১)'রাজধানীর রাস্তায়', তুলসী লাহিড়ীর(১৮৯৭-১৯৫৯)'ছেঁড়া তার'(১৯৪৪) ও'দুঃখীর ইমান'(১৯৪৬) বনফুলের (১৮৯৯-১৯৭৯) 'নমুনা', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৯০)'দীপশিখা', বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৭-১৯৭৮)'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দী'(১৯৪৩) ও 'নবান্ন'(১৯৪৪) প্রভৃতি নাটক ও একাঙ্কিকাও মন্বন্তর-আশ্রয়ী রচনা।

চিত্রকরদের তালিকা

প্রাণকৃষ্ণ পাল, ভবেশ স্যানাল, গোপেন রায়, রামকিঙ্কর, চিত্তপ্রসাদ, গোবর্ধন আশ, অতুল বসু, পরিতোষ সেন, সুধীর খাস্তগীর, সুনীল মাধব সেন প্রমুখ শিল্পীরা এঁকেছেন মন্বন্তর নিয়ে অনেক চিত্র।

পরিশিষ্ট - ২

চিত্র - ১

সৌজন্যে - জয়নাল আবেদিন

চিত্র - 2

সৌজন্যে - জয়নাল আবেদিন।

চিত্র - ৩

সৌজন্যে - জয়নাল আবেদিন

চিত্র - ৪

সৌজন্যে - চিত্ত প্রসাদ।

চিত্র - ৫

সৌজন্যে - চিত্ত প্রসাদ।

পরিশিষ্ট - ৩

'নানাবতী পেপার্স' পঞ্চাশের মন্বন্তরের অপ্রকাশিত গোপন দলিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অনেক তথ্য সেই 'ব্ল্যাক বক্সে' বন্দী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের গবেষক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও নানাবতীর অপ্রকাশিত দলিল' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংস্কৃতি ও সমাজ' পত্রিকায় প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৩ তে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য নানাবতীর দলিলের গুরুত্ব অপরিসীম। নানাবতী দলিল নিয়ে রচিত নিরঞ্জন সেনগুপ্তের এ প্রবন্ধটির প্রতিলিপি কোন রূপ পরিবর্তন না ঘটিয়ে এখানে সংযোজন করা হল।

— গবেষক।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও নানাবতীর অপ্রকাশিত দলিল

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

গত দু'শ বছরের ইতিহাসে ভারতে দুর্ভিক্ষের বা মন্বন্তরের ঘটনা অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। দুর্ভিক্ষের কারণ দর্শাতে গিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ ভারতের কৃষককেই দায়ী করেছেন। আর করেছেন এদেশের আবহাওয়াকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে আজ অবধি অসংখ্য ছোট বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এদেশে। সাম্প্রতিককালে তের'শ পঞ্চাশের মন্বন্তর গণমৃত্যু ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে অন্য সব মন্বন্তরকে ছাড়িয়ে গেছে। আনরিসড্-ইউনিসেফ-ক্রেসিডা (UNRISD-UNICEF-CRESSIDA) গবেষণা প্রকল্পের পক্ষে পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে মনিলাল নানাবতীর দলিল দেখতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য সেই অপ্রকাশিত বিশাল দলিলের অনেক কিছুই আমার দেখা হয়নি কম সময়ের স্বল্পতা। যেটুকু দেখতে পেরেছি তা থেকে অংশ বিশেষ বাঙলায় অনুবাদ করে এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে। একেবারে অপরিহার্য না হলে কোন মন্তব্য না করেই। তবে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার জন্য যেখানে হস্তক্ষেপ একান্তই প্রয়োজন সেখানেই কিছুটা অদল বদলের স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে মূল তথ্যে হস্তক্ষেপ না করে।

নানাবতীর দলিলের গুরুত্ব বুঝতে হলে যে পটভূমিতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ অনুসন্ধানের জন্য উডহেড কমিশন তৈরি হয়েছিল সেই পটভূমি এবং সেই সঙ্গে মনিলাল নানাবতীর কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা দরকার। তাই গোড়াতেই সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হচ্ছে।

উনিশশো চুয়াল্লিশের গোড়ার দিকে মন্বন্তরের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। অবশ্য সরকারের "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত" মতে দুর্ভিক্ষ তখন একেবারেই অনুপস্থিত। ফলে, সরকারি পরিচালনায় যে সব লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল, 1943 সালের ডিসেম্বর থেকেই সরকারি নির্দেশে তা বন্ধ করে দেওয়া হল। বাঙলা সরকার মোট সাড়ে তিন হাজারের কিছু বেশি (3621 টি) লঙ্গরখানা চালাত এবং 1247টির মত বেসরকারি লঙ্গরখানাকে সাহায্য দিত।[1] সরকারের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে দুর্ভিক্ষের কিছু হের ফের হলনা বরং সমস্যা হল ক্রমবর্ধমান। রিলিফ এবং পুনর্বাসনের বোঝা বিরাট আকারে এসে চাপল বেসরকারি সংগঠনগুলির কাঁধে।

বাঙলা সরকার মন্বন্তরের ব্যাপারে 1943 সালের ডিসেম্বরেই পুরোপুরি হাত ধুয়ে ফেললেও বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। পরিসংখ্যানের ভুল নামতা আউড়ে বাঙলায় মন্বন্তর ও তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে লণ্ডনে, ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বসে যে পণ্ডিতেরা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন, চার্চিলের কাছে লেখা এক টেলিগ্রামে ওয়াভেল তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে লিখেছিলেন—আগামী বছর অর্থাৎ 1944 সালে "গত বছরের চেয়েও বিরাটাকার এক দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না"।[৭]

ইতিমধ্যে বাঙলার গ্রাম থেকে যে এক কোটি দরিদ্র কৃষক পুরুষ রমণী ও শিশু খাদ্যের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে পথে নেমেছিল তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ মন্বন্তরে কৌত হয়েছে। বাকি পঁয়ষট্টি লক্ষ নিরাশ্রয়, ভূমিহীন, জীবিকাহীন মানুষ শহরের ও গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উনিশশো চুয়াল্লিশের গোড়ায় এই ছিল বাঙলা ও তার আবহ।[৮]

মন্বন্তরের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন গণসংগঠনের কাছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে বাঁচানোই ছিল একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। রিলিফ ছিল মূল লক্ষ্য। পিছন ফিরে তাকানোর সময় তখন ছিল না। কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রথম ধাপটা কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ-সৃষ্ট' সেই মন্বন্তরের কারণ অনুসন্ধানের—অপরাধীদের খুঁজে বের করার—তদন্তের দাবি জোরালো হয়ে উঠল। গোড়ায় দিকে ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ তদন্তের জন্য কমিশন বসাতে রাজি ছিল না কারণ এ ধরনের কমিশন যে বীভৎস সত্য উদ্‌ঘাটিত করবে তাতে শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও ভারত সরকারের মাথা কাটা যাবে। প্রথম টায় তাই দুর্ভিক্ষ তদন্তের জন্য একটা 'রয়াল কমিশন' গঠনের ইচ্ছে ছিল ভারত সরকারের, যাতে নমো নমো করে কাজ সারা যায়। অর্থাৎ সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙে।

কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তখন গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে গেছে। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোবিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলেছে। পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে আমেরিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমবর্ধমান। এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বৃটেন যে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ভাগ্যরেখায় তার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

শেষ পর্যন্ত দেশ ও বিদেশে জনমতের চাপে, বিশেষ করে সম্ভবত ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থার কথা ভেবেই, ভারত সরকারকে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয় স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে। 1944 সালের 24 জুন কমিশনের সদস্যদের নাম গেজেটে প্রকাশিত হয়। উডহেড ছাড়া কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—ডা. ডব্লু. আর. অ্যাকরয়েড, এস. ভি. রামমূর্তি, খান বাহাদুর আফজল হোসেন, মনিলাল বি. নানাবতী এবং আর. এ. গোপাল-স্বামী (কমিশনের সেক্রেটারি)। ভারতীয় বৃহৎ ব্যবসায়ীদের একজন প্রতিনিধিকে কমিশনে রাখার প্রস্তাব করেছিলেন ভারত সচিব আমেরি। কিন্তু ওয়েভেল রাজি হন নি। যুদ্ধের

সময়ে এরাই ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, এবং চুটিয়ে ব্যবসা করে মুনাফাও করেছে। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছে, ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা তখন রাতারাতি দেশপ্রেমিক বনে গেছে। 1944 সালের 28 ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এক গোপন রিপোর্টে ভারতীয় বুর্জোয়াদের মতিগতি সম্পর্কে লিখেছিল যে "রুশ দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা যেমন মেনশেভিকদের পক্ষে ছিল ভারতের বুর্জোয়ারাও তেমনি কংগ্রেসের পক্ষে গিয়ে ভিড়েছে"।[4]

কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মনিলাল নানাবতী দীর্ঘকাল বরোদার দেশীয় রাজ্যের দপ্তরে কাজ করেছেন। 1942 সাল থেকে তিনি 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স' এর সভাপতি ছিলেন। এককালে তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর ডেপুটি গভর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 1942 সালেই নানাবতী এবং সি. এন ভকিল-এর যৌথ সম্পাদনায় একটি বই প্রকাশের কাজ শুরু হয়। বইটির নাম 'ইনডিয়া স্পিকিং'। ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সামরিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের উপর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, এইচ. এন কুঞ্জরু, সি. এন ভকিল প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের লেখা প্রবন্ধের সংকলন ছিল গ্রন্থটি। নানাবতী এই গ্রন্থে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন তাতে ভারতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন যে এই অবস্থা চলতে থাকলে অচিরে এদেশে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে মনিলাল নানাবতীর ভূমিকা দুঃসাহসী এবং গৌরবজনক।

উডহেডের নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন কাজ শুরু করার আগেই স্থির হয় যে, কমিশনের সমস্ত সাক্ষ্য গোপনে গৃহীত হবে। ভারতে ইংরেজ সরকারের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য এটা প্রয়োজন ছিল।

1945 সালের আগস্ট মাসে তদন্ত কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট নামে একটি চটি বই ছাপা হয়ে বের হয়। যুদ্ধের বাজারে কাগজের দুর্মূল্যতার দোহাই দিয়ে অত্যন্ত কম সংখ্যায় ছাপান হয়েছিল এই রিপোর্ট। কাজেই প্রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে।

এতো গেল প্রকাশিত রিপোর্টের ইতিহাস। তদন্ত কমিশনের কাছে প্রায় আড়াই শ সাক্ষী—রাজনৈতিক দল, সেবা প্রতিষ্ঠান, কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, ব্যবসায়ীদের সংগঠন, মহিলা সংগঠন—প্রভৃতির প্রতিনিধি এবং সরকারী ও সামরিক বিভাগের বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সেই সব সাক্ষ্যের বয়ান ছাপার জন্য ছাপাখানায়ও গিয়েছিল। সরকারি ছাপাখানায় তা কম্পোজও করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের নির্দেশে আকস্মিক ভাবে সেই দলিল ছাপান বন্ধ হয়।

সরকারি প্রেসে কম্পোজ করা প্রুফ- [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible],

শ্রী মনিলাল নানাবতী। এছাড়া কমিশনে যে সব অফ্ দা রেকর্ড (off the record) আলোচনা হয়েছিল তারও নোট রেখেছিলেন নানাবতী। পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো প্রায় হাজার দেড়েক পৃষ্ঠার সেই অসংশোধিত গ্যালি প্রুফ এবং অত্যন্ত গোপনীয় নোটের ছটি ফাইল আজ "নানাবতী পেপার্স" নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এই নানাবতী দলিল দিল্লিতে মহাফেজ-খানায় রাখা আছে। বাঙলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর সেই বিস্ফোরক দলিল কিন্তু আজও অপ্রকাশিত। ভারতে ইংরেজ সরকার সেই দলিল প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছিল। কেন, তা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের বত্রিশ বছরের মধ্যে ভারত সরকারও সে দলিল প্রকাশ করেনি কেন? দলিল পড়লে সম্ভবত তাও বোঝা শক্ত মনে হবে না।

কমিশনের সামনে কি ধরনের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল, এখানে তার কিছু কিছু অনুবাদ করে দেওয়া হচ্ছে। অনুবাদ আক্ষরিক নয়।

বাঙলা সরকারের স্পেশাল অফিসার এল. জি পিনেল 1944 সালের 15 আগস্ট কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন: "জাপানীরা কেন যে আমাদের আক্রমণ করল না এ রহস্যের সমাধান আমি আজও খুঁজে পাইনি। আকিয়াবের পতনের পর জেনারেল আলেক-জাণ্ডারের বাহিনী উত্তর বর্মা থেকে পিছু হটতে শুরু করলে দলে দলে রেফিউজি এ দিকে চলে আসতে থাকে। সেদিন জাপানীদের অগ্রগতি আটকাবার মত কেউ ছিল না। চট্টগ্রামের উদাহরণ দিয়েই বলছি, সারা চট্টগ্রাম জেলায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না। সামান্য কিছু ফৌজ ছিল চট্টগ্রাম শহরে। তাদের উপর নির্দেশ ছিল পালাবার পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়ে যাওয়ার। নোয়াখালিতে জজ কোর্টের সামনে কয়েকটা মাত্র ফিল্ড গান বসান ছিল। আমি খুব খোলাখুলিই বলছি, ডিনায়াল লাইনের এপারে কার্যকর প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ডিনায়াল লাইনের অন্য পারে অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা সমস্ত নৌকা সরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম সেখানে যে কোন মুহূর্তে জাপানীরা এসে যেতে পারত।"

পিনেলকে একাধিকবার সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। শেষের দুবার তিনি কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন। পিনেলকে প্রশ্ন করা হয়—সে সময়ে (1942 সালে) বাঙলা প্রদেশে জাপানীদের পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপের কোন ঘটনা তাঁর জানা আছে কিনা। পিনেল বলেন: "আমি শুনেছি যখন আমরা ডিনায়াল এরিয়া থেকে সব নৌকা তুলে আনছি অর্থাৎ যখন ডিনায়াল এরিয়াতে চাষ বাসের জন্য টাকা লগ্নি করা একেবারেই নিরাপদ ছিল না, ঠিক সেই সময়ে কিছু ব্যবসায়ী ডিনায়াল এরিয়াতে পরের বছরের চাষের ফসলের জন্য চাষীদের প্রচুর টাকা দাদন দিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি শুনেছি সে টাকা বিদেশী উৎস থেকে এসেছিল। আমাদের অর্থনীতিকে তছ্নছ করে দেবার এই একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ছাড়া পঞ্চম বাহিনীর আর কোন কার্যকলাপের কথা আমি জানিনা।"

কোন্ ব্যবসায়ী বা কে এই দাদনের টাকা বিলি করেছিল? পিমেল তাঁর সাক্ষ্যে কারো নাম করেন নি। কিন্তু নাম বলে দিয়েছিলেন ম্যাক ইনেস তাঁর সাক্ষ্যে।

ম্যাক ইনেসের বাড়ি স্কটল্যাণ্ডে। যুদ্ধের আগে চট্টগ্রামে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বড় কর্তা ছিলেন ম্যাক ইনেস। 1943 সালের জানুয়ারিতে বাঙলা সরকার তাঁকে 'গ্রেন পারচেজিং অফিসার' এর পদে নিয়োগ করে। ছয় মাস এই পদে কাজ করে ম্যাক ইনেস বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। ম্যাক ইনেস বলেছেন: "ইস্পাহানি কোম্পানির এক প্রতিনিধি ছিল তখন চট্টগ্রামে। ডিনায়াল পলিসি কার্যকর করা হলে আমি জানতে পারি যে ইস্পাহানি কোম্পানি বাখরগঞ্জ এলাকায় চাষীদের টাকা দাদন দিচ্ছে। উদ্দেশ্য 1942 সালের শীতের ফসল সব কিনে নেওয়া। জাপানীরা তখন এগোচ্ছে। এরকম একটা সময়ে কোন ব্যবসায়ী, যে ফসলের বীজ তখনও মাটিতে, সেই ফসল কেনার জন্য দাদন দেবে, তা ভাবতেও পারা যায় না। তাছাড়া সেবার বিশেষত জুন-জুলাই মাসে, খুবই কম বৃষ্টি হয়েছিল। ইস্পাহানি বোধ হয় আশা করেছিল, যাই হোক না কেন সে তার ফসল চড়া দামে বেচতে পারবেই। তা না হলে কেউ ঐ অবস্থায় অত টাকার ঝুঁকি নেয় না। কেন সে এই ঝুঁকি নিয়েছিল? এর উত্তর আমার দেওয়ার কথা নয়।" পিমেল বলেছেন এদেশের অর্থনীতিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে জাপানী পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপের একটি মাত্র ঘটনা তাঁর জানা ছিল, সে হচ্ছে ডিনায়াল এরিয়াতে জাপানী আক্রমণের মুখে প্রচুর টাকা দাদন দেওয়া। ম্যাক ইনেস কমিশনকে বলে দিয়েছিলেন ইস্পাহানিই সেই দাদনদার। তখন বাঙলা শাসন করছে মুসলিম লীগ। ইস্পাহানিকে তৎকালীন সরবরাহ মন্ত্রী সোহরাবর্দি চাল কেনার একচেটিয়া অধিকার দিয়েছিলেন। ইস্পাহানি বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলা থেকে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নামে বেনামিতে চাল কিনে, কম মূল্য থেকে খেপে খেপে দাম বাড়াতে বাড়াতে সর্বোচ্চ দামে বাঙলা সরকারকে চাল বেচতো। ইস্পাহানির এই ব্যবসা নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ হওয়ায় তদন্ত কমিশন ই. সি. প্রাইস্ এর নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন গঠন করেন। প্রাইস কমিশন ইস্পাহানির ব্যবসার যে ভয়াবহ তথ্য পেশ করেছিল কমিশন তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। শ্রীমণিলাল নানাবতী ও শ্রীরামমূর্তি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেন। মাত্র এক ভোটের জোরে কমিশন ইস্পাহানি কোম্পানিকে রেহাই দেবার সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নেয়। ইস্পাহানিকে কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। তিনি সাক্ষ্য দিয়ে ছিলেন। ইস্পাহানি বাঙলার শাসকদল মুসলিম লীগকে টাকা যোগাতেন। প্রকৃতপক্ষে ইস্পাহানিই ছিলেন বাঙলায় মুসলিম লীগের কর্ণধার। ইস্পাহানিকে লীগ এর সাংগঠনিক নেতৃত্বে নিয়ে আসার জন্য জিন্না সাহেবের কাছে নাজিমুদ্দিনের আবেদনের দলিল মহাফেজখানায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফাইলে রয়েছে।

ইস্পাহানি ছিলেন রাঘব বোয়াল। ক্ষমতাসীন দলের মদতের অভাব তাঁর ছিল না। তবে বিরোধী দলের মদতে পুষ্ট চালের বেনামদার ব্যবসায়ীর অভাবও সেদিন ছিল না। হিন্দু

মহাসভা বা কংগ্রেস ইস্পাহানিকে নিয়ে যতটা হৈ চৈ করেছিল এইচ. দত্তকে অথবা রণদা প্রসাদ সাহাকে নিয়ে ততটা করেনি। সাম্প্রদায়িকতা ছিল তখন রাজনীতির অন্যতম অস্ত্র। সরকারী এবং বিরোধী দলেরা সে অস্ত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে সমানভাবে ব্যবহার করতেন। এই এইচ. দত্ত সম্বন্ধে ম্যাক ইনেস তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, "ইস্পাহানি, হবিবুর রহমান বক্স, হোসেন করিম দাদা—এরা ছাড়াও তৃতীয় এজেন্ট ছিল এইচ. দত্ত। ......লোকে বলত চালের ব্যবসায় তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতার বেনামদার। ...কলকাতায় থাকার সময় আমি যে সব রেকর্ড পড়েছি তাতে দেখেছি ডিনাজপুর এরিয়া থেকে গবর্ণমেন্টের টাকায় তিনি বেশ ভাল পরিমাণে চাল কিনেছিলেন, এবং তার হিসেব দিতে তিনি ব্যর্থ হন।" সমসাময়িককালে সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতির অন্যতম অস্ত্র হলেও, পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে ব্যবসায়ীরা পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্থোপার্জন ও মুনাফার পাহাড় খাড়া করেছিল, তাদের না ছিল কোন জাত, না ছিল তাদের কোন সম্প্রদায়। ফলে তারা হিন্দু না মুসলিম এ প্রশ্ন শুধু অবান্তরই নয়—বিভ্রান্তিকরও বটে। পিনেলের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সাক্ষ্য ছিল অফ দ্য রেকর্ড উক্তি। নানাবতী অনুগ্রহভাবে এসব টুকে রেখেছিলেন। নানাবতী পেপারস্ এর 6 নম্বর ফাইলে সেই দলিলটি পাওয়া যাবে। নানাবতী লিখেছেন: "আজকের সেশনে পিনেলকে ডাকা হয়েছিল 1943 সালের গোড়ার দিকে যুদ্ধকালীন 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর জন্য কি পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করা হয়েছিল তা জানার জন্য।"

পিনেল সেদিন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন: "সে সময়ে সমস্যাটা ছিল এই ধরনের: হয় কলকাতা এবং কলকাতাকে ঘিরে 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর জন্য প্রচুর খাদ্য মজুত রাখো, অথবা খাদ্য গ্রামাঞ্চলে যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। কলকাতাতে আমরা প্রচুর খাদ্য-মজুত করেছিলাম। স্বভাবতঃই এর অর্থ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য লোকের অনাহার-মৃত্যু। অন্যথায় শহরাঞ্চলে গোলমাল ও বিক্ষোভ শুরু হতো। দুদিকেই বিপদ। শহরে 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর মানুষজনকে খাইয়ে রাখতে না পারলে গোলমাল, দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে—গবর্ণমেন্টের যুদ্ধ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে কয়েক শতাংশ লোক না খেতে পেয়ে ধীরে ধীরে মরবে। শেষপর্যন্ত শহরের খাবার যোগানটা ঠিক থাকুক এটাই আমরা স্থির করেছিলাম।" এই সাক্ষ্যের নির্গলিতার্থ হচ্ছে—দুর্ভিক্ষ যে হবে সেটা সরকার জানতো এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যার মানচিত্র ভেবে চিন্তেই তৈরি করা হয়েছিল।

টোটাল ওয়ার বা সামগ্রিক যুদ্ধের চেহারাটা আলাদা। এযুদ্ধে সামরিক উপকরণের উৎপাদনের মধ্যে. পিন্-আপ গার্লদের ছবি ছাপাবার ছাপাখানাও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং তা 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর আওতায় পড়ে। কলকাতাকে ঘিরে সেদিন ভারতে যুদ্ধ-শিল্পের পত্তন সভাবে গড়ে উঠেছিল। গম থেকে মদ, চালের খাড় থেকে স্টার্চ

তৈরির কারখানা থেকে ছোট বড় নানা প্রকার 'যুদ্ধশিল্প' সবই ছিল 'এসেনশিয়াল সার্ভিস'। 1944 সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেন কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এম. বর্মন। শ্রী বর্মন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন :

"কলকাতার জনসংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যের ভীড় ক্রমশ বাড়ছে। বৃটিশ অথবা মার্কিন সৈন্য তাদের সামরিক ক্যানটিনের র‍্যাশান পাওয়া সত্ত্বেও সাধারণের জন্য হোটেলগুলিতে ভীড় করছে, গোগ্রাসে খাবার গিলছে। কিন্তু কলকাতায় সাধারণের ভোগের জন্য খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই নেই। কলকাতা কর্পোরেশন দাবি করেছিল শহরে র‍্যাশনিং চালু করা হোক এবং অন্য প্রদেশ থেকে কর্পোরেশনকে খাদ্য আমদানি করার অনুমতি দেওয়া হোক। সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়।"

কলকাতায় বোমা বর্ষণের পর পিনেলের সঙ্গে কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের একটি গোপন বৈঠক হয়। তখন বোমার ভয়ে কলকাতা জনশূন্য। পিনেল সেই সভায় মন্তব্য করেছিলেন—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কলকাতায় বোমা বর্ষণ আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে।"

বর্মন সাহেব কমিশনের সামনে প্রাণ খুলে কথা বলেছিলেন। রেখে ঢেকে নয়। "খাদ্য সংকট ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠছিল কিন্তু তা হলেও খাদ্য রপ্তানির অদৃশ্য খেলা বন্ধ হয়নি। কলকাতার বন্দরে যে কোন জাহাজ এসে ভিড়লেই তারা প্রায় একবছরের জন্য নিজেদের জাহাজের তো বটেই, এমন কি একই লাইনের অন্য জাহাজের জন্যও, খাদ্য-রসদ মজুত করে তবে বন্দর ছাড়ত। চিনি, ঘি, আটা, চালের এক বছরের রসদ তারা নিয়ে যেত। যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্প প্রকল্পের চাহিদা খাদ্যের মজুত শুষে নিত। মদ ও আঠা তৈরীর শিল্পে দানা শস্য ব্যবহৃত হত।" মদ তৈরীর জন্য যখন গমের অবাধ ব্যবহার চলছে তখন কলকাতার পথে হাজারে হাজারে গ্রামের মানুষ এসে মরছে না খেতে পেয়ে। সেই সব মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থাও করা যাচ্ছে না। কারণ কঠিন আইন। বৃটিশ শাসনের আইন অনুসারে বেওয়ারিশ মৃতদেহ কারো ছোঁয়ার অধিকার নেই। বর্মন সাহেব তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন—"মৃতদেহ ছোঁয়া পর্যন্ত যাবেনা। কারণ আইন বলে, বেওয়ারিশ লাশের এক মাত্র জিম্মাদার হচ্ছে পুলিস।"

কলকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত স্কুল দুর্ভিক্ষের সময় বন্ধ ছিল। স্কুলগুলিতে যথা সম্ভব দুর্গতদের আস্তানা করে দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর দীর্ঘকাল কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিকল করে দিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা শহরের কোন অধিবাসী কি অনাহারে মরেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরে? না মরেনি। নানাবতী খুব কমিশনে বিস্তৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন—"1943 সালে বাঙলা সরকারের হাতে মোট 202,000 টন খাদ্য এসেছিল। তার মধ্যে

140,000 টন কলকাতায় মজুত রাখা হয়েছিল। মাত্র 62,000 টন মফস্বলে পাঠানো হয়। .....গ্রামাঞ্চলে আরও খাদ্য পাঠানো হলে হয়তো দুর্গতদের জীবন বাঁচত। বৃহত্তর কলকাতার স্বার্থই ছিল সেদিন সরকারের কাছে সবচেয়ে বড়।.....বৃহত্তর কলকাতার একজন অধিবাসীও সেই মন্বন্তরে খাদ্যাভাবে মরেনি। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক কলকাতার পথে অনাহারে মরেছে গ্রাম ছেড়ে এসে।" যখন কলকাতার পথে হাজারে হাজারে লোক মরছে তখন শহরের বিশাল হোটেলগুলিতে খাবারের অভাব ছিল না। ঠিক সেই সময়ে বটানিক্যাল গার্ডেনস এ 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস' এর জন্য মজুত চালের বস্তা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম দ্বিতীয় শহর বলা হত তখন কলকাতাকে। এইচ. বি. এল ব্রাউও তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন—"শিল্পাঞ্চলের অধিবাসী নিয়ে কলকাতার জনসংখ্যা তখন 40 লক্ষ। কলকাতাকে ঘিরে শহর ও শহরের বাইরে চতুর্দিকে ভারতের যুদ্ধ শিল্পের পঞ্চাশ শতাংশ গড়ে উঠেছে। এই সব শিল্পে যারা কাজ করত তাদের পরিবারের লোকদের সংখ্যা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল 10 লক্ষ। এদের একটা বিরাট অংশ এসেছিল বাংলার বাইরে থেকে। বৃহত্তর কলকাতার মুখের গ্রাস যোগান দিতে তখন প্রয়োজন হতো প্রতি মাসে 50 হাজার টন খাদ্য। এর মধ্যে চালের চাহিদা ছিল 30 হাজার টন।"

কলকাতার এই রাক্ষুসে সামরিক ক্ষুধা মেটানো ছিল ভারত ও বাঙলা সরকারের সেদিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যেই তৈরী হয়—বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ফুড স্টাফ স্কিম। এই পরিকল্পনা অনুসারে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সকে সরকার থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বৃহত্তর কলকাতার বিরাট শ্রমবাহিনীকে খাইয়ে রাখার জন্য চাল কিনে মজুত করার। কলকাতা, হাওড়া, বজবজ, কাশীপুর, টিটাগড়, জগদ্দল, ভদ্রেশ্বর এবং চেতলা এই পাঁচটি জায়গায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের অসংখ্য গুদামে এবং গুদামের অভাবে অনেক সময় খোলা জায়গায় এই চাল মজুত করা থাকত। 1943 সালে সারা বছর ধরে এই মজুত চাল থেকে প্রতিমাসে গড়ে 1,20,229 মন চাল বিভিন্ন কারখানায় এবং ব্যবসায়িক সংস্থায় সরবরাহ করা হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের শ্রমিক, কলকাতার মধ্যবিত্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কর্মচারী, এদের যখন খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার এই নিপুণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তখনই কলকাতার ফুটপাতে গ্রাম থেকে আসা মানুষ হাজারে হাজারে মরেছে। মৃত্যুর জের চলেছে আরও দীর্ঘদিন ধরে। 1943 সালের 31 ডিসেম্বর বেঙ্গল চেম্বার অব কর্মার্সের উপরোক্ত গুদামে চালের 'ক্লোজিং স্টক' এর পরিমাণ ছিল তখন 1,77,679 মন। অর্থাৎ চাল ছিল, কিন্তু তা কলকাতাকে খাওয়ানোর জন্য।[৬] ব্যবসায়ীরা যেমন করেছে, সরকারও তেমনি চাল মজুত করেছে। এ যেমন একটা দিক

তেমনি লক্ষ লক্ষ মন চাল ও আটা গুদামের অভাবে পচে গেছে এবং তারপর তা ফেলে দেওয়া হয়েছে কলকাতা ও হাওড়ায়।

"...অধ্যাপক হিল দেখেছেন 'বটানিকাল গার্ডেনস' এ চালের বস্তার পাহাড় খোলা আকাশের নিচে জলে ভিজে পচছে। ...শালকিয়ায়, মন্ত্রী বরদা প্রসন্ন পাইন-এর পতিত জমিতে লরি বোঝাই করে 12 হাজার মন পচা আটা ও চাল ফেলে দেওয়া হয়েছে। ...বটানিকাল গার্ডেনস্ থেকে 500 টন পচা চাল ফেলে দেওয়া হয়েছে"—কলকাতা রিলিফ কমিটির সাক্ষ্য।[6]

ডিনায়াল এরিয়া থেকে কত চাল কেড়ে আনা হয়েছিল? এবং সেই চাল কোন্ খাতে খরচ করা হয়েছিল? ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ভারত সচিবকে সেই চালের যে হিসেব দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল মাত্র 40 হাজার টনেরও কম চাল সংগৃহীত হয় ডিনায়াল এরিয়া থেকে এবং তা মূলত অন্যত্র বিতরণ করা হয়েছে।[7] স্বভাবেই হোক অথবা অভাবেই হোক লিনলিথগো মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

কমিশনের সামনে সাক্ষ্যে মন্ত্রী শ্রী পি এন ব্যানার্জী ডিনায়াল এরিয়া থেকে তুলে আনা শুধু চালেরই যে হিসেব দেন তা হচ্ছে মোট 4,76,000 টন। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গে বিতরণ করা হয়েছে মাত্র 86,848 টন এবং বন্যাত্রাণে গেছে 52,716 টন। বাকি 3,36,436 টনের মধ্যে সিংহলে চালান গিয়েছে 52,716 টন। বাদবাকি খেয়েছে কলকাতার আশে পাশে শিল্পাঞ্চলের মানুষ এবং সৈন্য বাহিনী।[8]

এ শুধু গ্রামকে মেরে শহরকে বাঁচানো নয়। বৃটিশ সরকারের নীতিই ছিল মন্বন্তরের ঝাপটাটা গ্রামাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র, অসংগঠিত কৃষকের কাঁধে চাপিয়ে শহরে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের বাঁচিয়ে রাখা। কারণ গ্রামের মানুষ নাকি চিরকাল অনাহারে ও অনশনেই অভ্যস্ত। কিন্তু শহর সম্পর্কে সে ধরনের মনোভাব রাখলে চলবেনা। কারণ শহরগুলি বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় একএকটি বারুদের স্তূপের মত—এই ছিল লিনলিথগোর ব্যাখ্যা।

বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করেছিল কমিশনের কাছে। তাতে বলা হয়েছে: "1943 সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যবসায়ীদের এক সভায় ভারত গবর্ণমেণ্টের ফুড মেম্বার এন. আর. সরকার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বলেন যে ভারত থেকে এক কণা খাদ্য শস্যও বিদেশে চালান দেওয়া হবে না—1943 সালের 14 আগস্ট চেম্বার অব কমার্স গুলির কাছে এক টেলিগ্রামে ভারত সরকার জানান। 1937—38 সালে ভারত থেকে খাদ্য রপ্তানি করা হয়েছিল 900,000 টন। 1941—42 সালে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল 55,000 টন। কিন্তু 1942—43 সালে রপ্তানি দাঁড়ায় 3,70,000 টন। এই 3 লক্ষ 70 হাজার টনের মধ্যে 1 লক্ষ 85 হাজার টন রপ্তানি করা হয় সিংহলে। .....সরকার স্বীকার করেন যে 1943 সালের প্রথম সাত মাসে কলকাতা থেকেই 727 টন চাল

জাহাজে চালান যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়, 2,000 টন যায় পারস্য উপসাগরে। ...1942—43 সালে ভারত থেকে মোট যে চাল বিদেশে রপ্তানি করা হয় তার 60 শতাংশই যায় বাঙলা থেকে।"

দেখা যাচ্ছে, ভারতসরকার তার ঘোষিত নীতি কাজে মেনে চলেনি। ঘোষণাটা ছিল নিতান্তই প্রচারের উদ্দেশ্যে—বানানো কথা। খাদ্যশস্য রপ্তানী হবে না প্রচার করেও লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য বাইরে পাচার করা হয়েছে দেশবাসীকে উপবাসী রেখে। 1944 সালের 12 আগস্ট ভারত সরকারের মিউনিশন প্রডাকশনের ডাইরেক্টর জেনারেল—মেজর জেনারেল ই. উড তাঁর সাক্ষ্যে বলেন: "বাঙলা গবর্নমেন্ট প্রায়ই অভিযোগ করত যে কোন কোন কন্ট্রোল বাজারে তাদের উচ্চমূল্যে খাদ্য দিতে হত এবং সস্তা খাদ্য শস্যের দোকানেও তাদের খাদ্য সরবরাহ করতে হয়, ফলে তাদের দারুণ আর্থিক ক্ষতি হয়। আমার কিন্তু এ ব্যাপারটায় ঘোরতর সন্দেহ ছিল। ......আমার হিসেবে আমরা যে দামে বাঙলা সরকারকে খাদ্য দিতাম তার উপরে 6 টাকা বেশি দাম চড়িয়ে সরকার তা বেচত। ফলে প্রতি মাসে বাঙলা সরকার লাভ করত 75 হাজার টাকার মত।"

ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারি আর. এইচ. হাচিংস, কমিশনের সেক্রেটারি গোপাল স্বামীকে 1944 সালের 2 আগস্ট তারিখে এক চিঠিতে জানান: "গত 27 তারিখে আমি যখন কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিই তখন আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে ভারত থেকে এখনও বিদেশে সৈন্য বাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য চালান যাচ্ছে কিনা। উত্তরে আমি বলেছিলাম —না যাচ্ছে না। কমিশনকে সেদিন আমি ভুল তথ্য দিয়েছিলাম। তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি ইতালি ও মধ্য প্রাচ্যে এখনও সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য যাচ্ছে।"

উড সঙ্গে হাচিংস একটি সারণি পাঠান। তাতে দেখা যায় গম, আটা, চাল, ময়দা, ডাল, ঘি, চিনি সব মিলিয়ে 1943 সালে 1,01,340 টন খাদ্য বিদেশে সৈন্যদের জন্য পাঠানো হয় এবং 1944 সালের মার্চ পর্যন্ত সেই রপ্তানি অব্যাহত ছিল—পরিমাণ 59,133 টন।

কিরবি, হাচিংস, পিনেল, ম্যাক ইনেস, যে যার নিজের অপরাধ স্খালনের চেষ্টা করেছে তাদের সাক্ষ্যে। চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিরাও যে যার হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেছে। এদের কারো সাক্ষ্যেই মন্বন্তরের ভয়াবহ চেহারার বিবরণ নেই। তা থাকার কথাও নয়।

মন্বন্তরের সেই কঙ্কালসার ভয়াবহ চেহারার বিবরণ পাওয়া যায় টমাস ম্যানমোর ডেভিসের সাক্ষ্য থেকে। ফ্রেণ্ডস্ অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট-এর ভারতীয় শাখার পক্ষ থেকে ডেভিস মেদিনীপুরে যেখানে ঝাঁকি মহকুমায় ত্রাণ কার্য পরিচালনায় গিয়েছিলেন। ডেভিস তাঁর

সাক্ষ্যে বলেছেন : "কাঁথি মহকুমার সাধারণ অবস্থার দিনে দিনে অবনতি ঘটছে। কাঁথি শহরে, তার আশেপাশে, বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী রামনগর থেকে খাজুরি পর্যন্ত অনাহার ও রোগের প্রকোপ বাড়ছে। একদিন যারা 'কৃষক' নামে পরিচিত ছিল তাদের বর্তমান পরিচয় 'ভিক্ষুক'। এই ভিক্ষুকেরা সপরিবারে কাঁথি মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা প্রত্যেকেই কঙ্কালসার। কাঁথি থানার আশে পাশে খালগুলিতে পচা, গলা মৃতদেহ ভেসে চলেছে। পথের ধারে কুঁড়ে ঘর—সেখানেও পচছে মৃতদেহ। সৎকারের কোন ব্যবস্থা নেই। কাঁথি থেকে পানিপিয়া পর্যন্ত নৌকোয় যেতে যে দৃশ্য চোখে পড়েছে তা ভয়াবহ। দুর্গন্ধে পেটের ভাত অবধি উঠে আসে। ক্ষেতে মাঠে সর্বত্র পচা লাশের গন্ধ।"

সরকারি রিলিফ ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখে ডেভিসের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা এই রকম : "স্থানীয় লোকদের হাতে লঙ্গরখানা চালানোর ভার দেওয়ার এই নীতির অর্থ হচ্ছে দুর্গতদের হাতেই দুর্গতদের দেখাশোনার ভার দেওয়া। লঙ্গরখানাগুলিতে পরিচ্ছন্নতার অভাব প্রকট। সুপরিচালনার কোন ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে প্রচণ্ড দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহার। সরকার নির্দেশ দিয়েছেন গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার। এই নির্দেশের পিছনে দূরদৃষ্টি বলে কিছু নেই। গ্রামে দুর্গতদের কারো বাড়িতে এক সঙ্গে বহু লোকের রান্না করার মত বাসন-কোসন পাওয়া যায় না। লঙ্গরখানায় যারা খেতে আসবে রান্নার কাঠ তাদেরই জোগান দিতে হবে।

"কাঁথি শহরে সরকারের খয়রাতী লঙ্গরখানা বেশিদিন টিকল না। বিপুল সংখ্যায় 'ভিক্ষুকের' দল আসতে শুরু করল। শহরের আবর্জনা অপসারণের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠল। শহরের বাজার অত্যন্ত ছোট। সেখানে গড়ে প্রতিদিন পনেরটি মৃতদেহ দেখা যেত। পরে ঠিক হল 4 মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে এক একটি অঞ্চলে 6টি করে লঙ্গরখানা খোলা হবে যাতে লঙ্গরখানাগুলিতে 'ভিক্ষুকদের' ভিড়ের চাপ বেশি না পড়ে। কিন্তু এবারেও সরকারের ভাগ্য বিরূপ। দাউলিতে একটি ক্যানটিন চালু হয়। প্রথম দিনেই সেই ক্যানটিনে 23 জন দুর্গত মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ত্রাণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয় রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে। মফস্বল অঞ্চলে লঙ্গরখানা ব্যবস্থার এইসব সমস্যা ছাড়াও সমস্ত ব্যবস্থাটার মধ্যেই গলদ ছিল। বিশেষ করে যে খাদ্য বিতরণ করা হত তা ছিল একেবারেই অখাদ্য। এই সব লঙ্গরখানায় খিচুড়িতে চাল প্রায় থাকতই না। যেমিন কোডে যে চালের পরিমাণের বিধান আছে তার আটভাগের এক ভাগ চালও থাকত কিনা সন্দেহ। খিচুড়ির মধ্যে অধিক পরিমাণে থাকত জোয়ার এবং শাক পাতা—যা সেই অবস্থায়, অনাহারক্লিষ্ট লোকদের পক্ষে খাওয়াও ছিল বিপদজনক। গবর্ণমেণ্ট যে খাদ্য দিত তার খাদ্যমূল্য জীবন ধারণের পক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না।

"এই অঞ্চলে লঙ্গরখানার খাবারের চেয়ে বাঁচা খাদ্যের খয়রাতী সাহায্যই সকলে পছন্দ

করত। কারো বাড়িতে অনাহারে কেউ মরলে ঘটনা চেপে যেত বাড়ির লোকে—যাতে মৃতের প্রাপ্য খাদ্যটুকু থেকে তারা বঞ্চিত না হয়।"

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন। গণ-সংগঠনের মধ্যে অসংখ্য ত্রাণ সংস্থা, মহিলা সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, পি. আর. সি. সাক্ষ্য দিয়েছেন অথবা স্মারকলিপি পেশ করেছেন, কমিশনের কাছে। সাক্ষ্য দিয়েছেন মন্ত্রী, সরকারি কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর পদস্থ অফিসাররা। সরকারি পদস্থ অফিসারদের মধ্যে সম্ভবত দীর্ঘতম স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন জাস্টিস এইচ. বি. এল. ব্রাউন। পূর্বাঞ্চলের তিনি ছিলেন 'রিজিওনাল কমিশনার'।[৭]

সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের অধিকাংশই তাঁদের সাক্ষ্যে স্বীকার করেন যে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট খাদ্যনীতি ছিল না। এবং খাদ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল তাকে প্রাগৈতিহাসিক বললে ভুল করা হবে না। ভারত সরকারের এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন অ্যাডভাইসর ডি. আর. শেঠি তাঁর সাক্ষ্যে কৃষি পরিসংখ্যান সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন: "গ্রামের চৌকিদার সপ্তাহে একদিন থানায় আসত। থানার ছোট দারোগা তাকে জিজ্ঞেস করতেন—"তোমার এলাকায় কত ধান হয়েছে?" চৌকিদারের অবধারিত উত্তর হতো—"গত সনের মতই।" দারোগা জিজ্ঞেস করত—"কিন্তু কত?" উত্তর—"দশ আনার মত।" সেই হিসেব তারপর যেতো মহকুমা হাকিমের অফিসে। সেখানে কেরানিবাবু যদি দেখতেন গত কয়েক বছরের হিসেবের থেকে বর্তমান হিসেবে বড় রকম হের ফের হচ্ছে তাহলে তিনি বলতেন—"আগাগোড়া ভুল।" এরপর তিনি গত কয়েক বছরের ফলনের গড় পড়তা হিসেব কষে যে সংখ্যা পেতেন তাই সে বছরের ফলনের হিসেব বলে লিখে রাখতেন। সেই হিসেব সেখান থেকে কলেক্টরের অফিসে গেলে সে অফিসের কেরানিবাবু আবার দরকার হলে একই রকম ভাবে সংশোধন করে পাঠাতেন। সেই পরিসংখ্যান তারপর যখন কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টরের কাছে যেতো, তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকতো না তখন।"

অধিকাংশ সাক্ষ্যই একটি কথার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে যে ভারত দীর্ঘকাল ধরে খাদ্য-ঘাটতি দেশ। এক নিঃশব্দ দুর্ভিক্ষ ভারতের গ্রামাঞ্চলে চিরস্থায়ী হয়ে ছিল। এই অবস্থাতেও ভারত যেমন খাদ্য আমদানি করত, তেমনি চাল রপ্তানিও করত বিদেশে। যুদ্ধ এবং পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ পরিস্থিতি ভারতের এই দুর্বল খাদ্য অর্থনীতির ভারসাম্য উল্টে দেয়। এমনটা যে হবে, তা ভারতে ইংরেজ শাসকদের আগে থেকে বোঝা এবং বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের উপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বোঝা বর্ধিত হয়েছে থাকে

ঘাটতি যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডে না খেতে পেয়ে লোক মরেনি। কিন্তু বাঙলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরে 35 লক্ষ লোক মরেছে। শুধু মরেছে তাই নয়, এই মন্বন্তর বাঙলার সমাজ ও অর্থনীতিকে আমূল উপড়ে ফেলেছে। সেই ছিন্নমূলের দায়ভাগ আজও আমরা বহন করে চলেছি। নানাবতীর দলিল উচ্চকণ্ঠে সাক্ষ্য দেয়—বাঙলার মন্বন্তরের জন্য দায়ী যুদ্ধের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সুপরিকল্পিত লুণ্ঠন ও কৃষক হত্যার নীতি, বেপরোয়া চোরা-কারবার ও মজুতদারি।

গ্রাম বাঙলার অসংগঠিত দুর্বল কৃষক সেদিন না খেতে পেয়ে মরেছে কিন্তু প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে পারেনি। সংগঠিত প্রতিরোধের মত শারীরিক অথবা মানসিক অবস্থা তাদের ছিল না, আর ছিল না সেই চেতনা, যে চেতনা মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে শেখায়, শেখায় দাবী আদায় করতে।

বাঙলার কৃষক এই অভাব পূরণ করে নিয়েছিল মন্বন্তরের পর তিন বছরের মধ্যে। সমগ্র বাঙলা জুড়ে তেভাগার লড়াই জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল যে মন্বন্তরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার পাঠও গ্রহণ করেছে তারা। ইতিহাসে প্রত্যেক সর্বনাশই সম্ভবত ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলময় কিছু সঙ্গে করে আনে।

তথ্য সূত্র :

1. পিপলস্ রিলিফ কমিটির স্মারকলিপি—নানাবতী দলিল—খণ্ড 1, পৃঃ 4
2. চার্চিলের কাছে ওয়াভেলের টেলিগ্রাম—9 ফেব্রুয়ারি, 1944—ট্রান্সফার অব পাওয়ার—খণ্ড 4, পৃ: 707 ; মানসার্জ সম্পাদিত : লণ্ডন।
3. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার স্মারকলিপি : নানাবতী দলিল : খণ্ড 1, পৃঃ 135
4. ট্রান্সফার অব পাওয়ার : মানসার্জ সম্পাদিত : খণ্ড 4, পৃঃ 765
5. নানাবতী দলিল—খণ্ড 1, পৃঃ 321
6. নানাবতী দলিল—খণ্ড 1, পৃঃ 74
7. ট্রান্সফার অব পাওয়ার : মানসার্জ সম্পাদিত : খণ্ড 4
8. নানাবতী দলিল—খণ্ড 1, পৃঃ 289
9. নানাবতী দলিল—5 নম্বর ফাইল।